রবীন্দ্রগানের গায়কি ও প্রয়োগ ভাবনা

দেবশ্রী দোলন*

[সারসংক্ষেপ : রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। যার অবদান বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় সুস্পষ্ট। সংস্কৃতির সকল ধারায় অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ সংগীতের প্রতি একটু বেশিই স্পর্শকাতর। তাই তিনি তাঁর গানের গায়কির দিকে একটু বেশিই সচেতন ছিলেন। গানের গায়কির বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে যদিও তিনি স্বরলিপি প্রথা অনুসরণ করেন, তা সত্ত্বেও শিল্পীভেদে গায়কির তারতম্য যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়েও তিনি দ্বিমত করেননি। তবে তাঁর গানের প্রতি যেন অবিচার করা না হয়, সে দিকে লক্ষ রাখতে বলেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কি প্রসঙ্গ ছাড়াও আরেকটি বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস থাকবে, তা হচ্ছে রচয়িতাভেদে গানের সুরান্তর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের গানের ভাব ও ধারা অনুযায়ী কী ধরনের যন্ত্রানুষঙ্গ হতে পারে সে বিষয়েও খানিক আলোচনার প্রয়াস থাকবে। মোটকথা, রবীন্দ্রগানের উপস্থাপনে যে সকল বিষয়ে মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন তার মধ্যে গায়কি অন্যতম। তাঁর গানের কথা স্পষ্ট এবং সুর অনড় রেখে যে উপস্থাপন-মন্ত্র তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে এ প্রবন্ধে।]

তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী
আমি অবাক হয়ে শুনি
কেবল শুনি
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৯ : ৭)

বাংলা সংস্কৃতির অন্যতম নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সংগীতের এক বিশাল যজ্ঞক্ষেত্রের অন্যতম পুরোধা। বাঙালির মন ও মননের এক সুবিশাল অংশের প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালির জীবনে এক অবিনশ্বর স্থান দখল করে আছে এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে তার সুর ও গায়কির প্রশ্নও। তাঁর নিজের রচিত উপরে উল্লেখকৃত গানের লাইনে তার কিছুটা হলেও প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গান সেকালে রবিবাবুর গান হিসেবে অধিক পরিচিত ছিল। বংশপরম্পরা বা পারিবারিকভাবে সংগীতের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকলেও তাঁর নিজের রচনাতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ করা যায় বইকি! রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন ঠিকই, তবে তাঁর গানে শিল্পীর প্রভূত স্বেচ্ছাচারিতা করার সুযোগ তিনি রাখেননি। কিন্তু তিনি যে শক্ত হাতে এর প্রতিরোধ-প্রতিবিধান করেছেন এমনও নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "গায়কের কণ্ঠের উপর রচয়িতার জোর খাটে না সুতরাং ধৈর্য্য ধরে থাকা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই..." (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ২০০)।

এ কথার প্রেক্ষাপট হিসেবে বেছে নেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের গানের গায়কি ও সুরের নথিবদ্ধ ব্যবহার। তাঁর এমন অনেক গান রয়েছে যে গানের রচনাকালীন প্রেক্ষাপট বা তার নেপথ্যের তথ্য গানের আস্বাদই পালটে দিয়েছে। জানা যায়, শিল্প আস্বাদনকালে সৃষ্টিকালীন ইতিহাস

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

দিয়ে অধিকার করে রাখাটা রবীন্দ্রনাথ সাবলীলভাবে গ্রহণ করেননি। তবে এও ঠিক যে, আমরা যদি গানের ইতিহাসকে সম্পৃক্ত না করি তবে বদলে যেতে পারে তাঁর গানের গায়কি ।

সংগীত শিল্পেরই একটি প্রতীকবহ অংশ আর গান এই সংগীতেরই বিশেষভাবে নির্মিত মাধ্যম। শিল্প ও সংগীত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও তাদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো গায়ক নির্ভরতা। তাই ধরা হয় গায়কভেদে গানের পরিবেশনা কিছুটা বদলে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বজায় রাখতে ভীষণভাবে অনড় ছিলেন। আর সংগীতকার হিসেবে গায়ক-নির্ভরতার বিষয়টিও তাঁকে বেশ ভাবনায় আবদ্ধ করেছিল। আর এ সকল দিক বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সংগীতকারদের মধ্যে কিছুটা বৈসাদৃশ্যও চোখে পড়ে। যেমন– তিনি যে তাঁর গানকে অবিকল্প রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন তা বজায় রাখতে বিস্তর অনুনয়-অনুরোধ-আক্ষেপ করতে হয়েছে তাঁকে– "তোমাদের কাছে আমার মিনতি; তোমাদের গান যেন আমার গানের কাছাকাছি হয়, যেন শুনে আমিও আমার গান রূপে চিনতে পারি।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৫৭১)।

রবীন্দ্রনাথ গানের সুর আহরণ বা আস্বাদনে কখনো কার্পণ্য বা হীনম্মন্যতা প্রকাশ করেননি। তিনি যেখানে যেমন মাধুর্যপূর্ণ সুর শুনেছেন সেখানেই আস্বাদনের চেষ্টা করেছেন। সেসকল সুর শুধু আস্বাদনেই ক্ষান্ত হননি, ব্যবহার করেছেন নিজের রচনায়। কখনো সুরে কথা বসিয়েছেন, কখনোবা কথা আগে এসেছে সুরটি পরে, গানের কথাকে যদিওবা আমরা আমাদের ভাষিক সীমানার মধ্যে পাই বা অনুধাবন করি, তবুও সুরের এমনি এক সংগীতিক ধ্বনিজগৎ আছে যা নিরর্থ করে দিতে চায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত শব্দসমূহকে। শব্দকে তার সীমানা অতিক্রম করে অজানা অচেনা পথে অনুভূতিদেশে পৌঁছে দেয়। গানের বাহ্যিক আকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় গানের বিচার বিশ্লেষণগত দিক তো বটেই তা আস্বাদনের সময়ও বিশেষ ধরনের পাঠ আমরা গ্রহণ করি। এই "বিশেষ ধরনের" পাঠটি আমরা যারা গানকে দেখতে পাই তাদের কাছে একরকম, আর যারা দেখতে পাই না তাঁদের কাছে ভিন্ন রকম। যেমন– কবিতার সাথে যদি তুলনা করা যায় তাহলে বলা যায় শতবর্ষ পরেও যদি একটি কবিতাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হয় তবুও তার শরীর পালটায় না, কিন্তু কবিতা বা কবিতা নয় এমন কিছু যদি সুর দেওয়া হয় তখন তা গান হয়ে ওঠে এবং যে কেউ সেই গান গাইতে পারে। সেক্ষেত্রে গানের বাণী নির্দিষ্ট হলেও শিল্পীভেদে এর সুরের তারতম্য লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ গানের শরীর পালটাচ্ছে, স্বভাব পালটাচ্ছে কেবল বজায় থাকছে গানের কথাটুকু– যা কি না গান নয়।

রবীন্দ্রনাথের গানের যে রূপ সেটা তাঁর নিজের স্বভাবগ্রস্ত হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। কেননা গায়ক যতই আন্তরিক হোক না কেন যদি সত্যকে মেনে নেই তবে গায়কভেদে গানের স্বভাবে পরিবর্তন আসবেই। যেহেতু গায়কভেদে গায়কি ভিন্ন হবে তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের সুর বজায় রাখার যে মিনতি করেছেন তার কোনো চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যমতে, তিনি চেয়েছিলেন যাতে গানের মূলভাব ঠিক থাকে বা গান তার স্বভাবভ্রষ্ট না হয়, কারণ গায়ক তাঁর চিন্তার পরিধি ও সামর্থ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের যে অন্তর্নিহিত মাধুর্যে পৌঁছাতে না পারলে গান বিকৃত হবে এমনটাই আশঙ্কা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই শেষজীবনে এসে তিনি তাঁর রচিত গানের পরিবেশনা নিয়ে বেশ মনঃক্ষুণ্নই

হয়েছেন বলা যায়। শেষ বেলায় তিনি নিজেই নিজের গান চিনে উঠতে পারেননি। তাঁর হয়তো মনে হয়েছিল– গানের কথাটা শুধু তাঁর নিজের, সুরটা নয়।

রবীন্দ্রনাথ নিজের গানের ব্যাপারে খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী না থাকলেও সংগীত নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনা থেকে খুব একটা সরে আসতে চাননি। তবে রসিকভেদে গানের গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন হবে এটাই বাস্তব। কোনো প্রচলিত রীতি যখন রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন তখন তাঁর কথা ও সুরে রবীন্দ্রনাথ কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যও অনুসরণ করেছেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই বিশেষত্বটা রবীন্দ্রনাথের সকল রচনার মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেছে। তবে বাংলা রাগসংগীত, কীর্তন, রামপ্রসাদি, লোকসংগীত বা নিধুবাবুর টপ্পায় যে ভাব এটা সেভাব নয়, আর এটাই হলো রবীন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব শ্রেণির বাঙালিয়ানার সাংগীতিক প্রকাশ। এমন একটি অতিপরিচিত গান তিনজন তিনভাবে স্বরলিপি আকারে প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয়টি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তৃতীয়টি সরলা দেবী। তিনটি স্বরলিপিই সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো–

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

।।- া সা রা । রগা গা গা । গা গা গা। গমা- া গমগা।
০ আ মি । চি০ নি গো। চি নি তো। মা০ ০ ০০০

। রা- া রগা। রা-গা রা। র-পা ক্ষা। পধপা-া -া।।
রে ০ ও০ । গো০ বি। দে ০ শি নী। ০০০ ০ ০

২. দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

।।- া সা রা । গা গা গা। গা গা গা। গমা গপা মগা।
আ মি চি। নি গো চি। নি তোমা। ০ ০০ ০০

। গরা- া রা। রা-গা গরা। রা-পা পক্ষা।। ধাপা-া -া।
রে০ ০ও। গো বি দে। শি নী ০০।। ০০ ০ ০

৩. সরলা দেবী

।।- া সা রা । গা গা গা। সগা গা গা। মা- া মগা।
০ আ মি। চি নি গো। চি নি তো। মা ০ ০ ০

। রা- া রা। রগা রা। গা রা ধা। -া পা ক্ষা।
রে ০ ও। গো০ বি। দে ০ শি। নী ০০

। ধপক্ষা- া পা।।
০০০ ০ ০ ০

এই তিনটি স্বরলিপিই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে রচিত কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনোটার সঙ্গে কোনোটার হুবহু মিল নেই, তবে এটাও ঠিক যে এর কোনোটাই এমন নয় যে স্বরলিপি ভিন্নতার কারণে মূল গান চেনা যায় না। তেমনি আরও একটি গান "তবু মনে রেখো"-এর চারটি স্বরলিপি দেখা যায়, তবে সেগুলিও হুবহু এক নয়। এই তো গেল স্বরলিপিগত প্রভেদ,

রবীন্দ্রনাথের এমন অনেক গান আছে যাতে শিল্পীভেদে সুরের প্রক্ষেপণও পরিবর্তিত হয়ে যায়, কেউ হয়তো গানের কোনো এক জায়গায় মীড়ের ব্যবহার করেছেন কিন্তু অন্যজন তাঁর গায়কিতে একটু ভিন্নতা এনেছেন এখানেই গানের সুরের পরিবর্তন লক্ষ করা যায় কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই এদের কারো কারো শিক্ষাগুরু ছিলেন। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় যে, স্বরলিপিতে যে সুরান্তর তা রবীন্দ্রনাথ নিজে করেছেন কি না! সেক্ষেত্রে আবার উত্তরও তৈরি। শিল্পীভেদে যেমন সুর পরিবর্তন হয়, স্বরলিপিকার ভেদেও তার পরিবর্তন অবান্তর নয়।

গান সম্পর্কে তাঁর যে মতামত বা ধারণা তা প্রথম জীবনেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। যা কি না শেষ জীবন পর্যন্ত অটুট ছিল। বিশ বছর বয়সে একটি লেখায় তিনি লেখেন–

> ওস্তাদেরা গানের কথার উপর সুর দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাহারা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য। (সত্যজিৎ, ২০১৭ [https://www.boierhut.org])

কিন্তু প্রত্যেকটি গানের একটি নিজস্ব রূপ আছে, যা তাকে অন্য একটি গানের থেকে আলাদা ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে, যার খোঁজ পাওয়া যায় ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বরলিপি আকারে নথিবদ্ধ থাকার মাধ্যমে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গানে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেও তাতে খানিকটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর অন্যান্য প্রিয় গায়ক-গায়িকাদের মুখে শুনলেও ভিন্নতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে অনেক গান প্রথমে গীত হয়েছে, পরবর্তীকালে স্বরলিপিতে রচিত হয়েছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখা গান "স্বপন যদি ভাঙিলে" যা রামকেলি রাগে নিবদ্ধ। এই গানটি বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী গেয়েছিলেন শুদ্ধ আকারে। বিস্তার এবং তানসমেত সে গান রেকর্ডেরও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ওস্তাদ ভি ভি ঝলওয়ার গানটির স্বরলিপি তৈরি করেন, তখন সেখানে তান বা বিস্তারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তেমনি আরেকটি গান "বুঝি ঐ সুদূরে"। গানটি রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসবে সাহানা দেবীকে নিজে শেখান যা পরে সাহানা দেবী রবীন্দ্রভারতীর জন্য রেকর্ড করেন যা থেকে পরবর্তীকালে স্বরলিপি তৈরি করা হয়। এই সাহানা দেবীই একমাত্র ছিলেন যার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তাঁর গানের মূল সুর ধরে রাখতে পারতেন বলে সাহানা দেবীকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টির সাথে শুনতেন। এরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত আদরণীয় ও উচ্চশ্রেণির সংগীত শিল্পী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে গানের রূপটি পুরোপুরি গায়কনির্ভর হয়েই রইলো।

কিন্তু প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন যে, তাঁর গান অবিকৃতভাবেই গাইতে হবে। এ নিয়ে শ্রী দিলীপ কুমার রায়ের সাথেও তাঁর বিস্তর আলাপচারিতার প্রমাণ মেলে *সংগীত চিন্তা* নামক গ্রন্থে। সেখানে দিলীপ কুমার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যকার আলোচনায় রবীন্দ্রসংগীতের গায়কির বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠে। দিলীপ রায়ের সাথে তাঁর মতের মিল হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মতানৈক্যই চোখে পড়ে। দিলীপ রায় গানের স্বাধীন সুরবিহারের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন পরের মুখে তাঁর গান নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি নিজ মেয়েকে অপাত্রে দেওয়ার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চান নি। এদিকে দিলীপ রায় যেহেতু সাংগীতিক বিষয়টি হিন্দুস্থানি সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন তাই আলোচনার শুরুতেই তিনি

হিন্দুস্থানি গান ও বাংলা গানের গায়কির পার্থক্য নিয়ে আলাপ করেন। তবে এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ আগেই দিলীপ রায়কে মতপার্থক্যের সীমারেখা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন, "বাংলা ও হিন্দুস্থানী গান নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ যদি বা থাকে তাহলে অন্তত তার সীমাটি স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। নইলে সত্যের ছায়াটা বড় হয়ে অমিলটা প্রকাণ্ড দেখতে হয়" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের হিন্দুস্থানি সংগীতের দৃষ্টিভঙ্গিটি ছিল সৌন্দর্যবাদী তিনি হিন্দুস্থানি সংগীতের বিশেষভাবে বলতে গেলে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতির প্রবন্ধের গঠনগত প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যময় প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত রাগরূপায়ণের রসবস্তুকে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ, খেয়াল ভেঙে বাংলা গান রচনা করলেও এসব ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করেছেন। আর তা হচ্ছে সংগীতের সরলরৈখিক গঠন প্রক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে হিন্দুস্থানি সংগীতের অলংকার বাহুল্য বর্জন করেছেন এবং সুরের সরলরেখাটিকে ধরে বাণীর মর্মবস্তুটিকে তীব্র করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু দিলীপ কুমার তাঁর এই প্রক্রিয়ার সাথে সহমত পোষণ করেননি। মূলত রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে শিল্পীর সহজাত সুরবিহারে (Improvisation) কোনো স্বাধীনতা না দেওয়াতেই দিলীপ কুমার তাঁর মতানৈক্য প্রকাশ করেন। দিলীপ কুমারের যুক্তি অনুযায়ী হিন্দুস্থানি সংগীতে যেরূপ নির্দিষ্ট রাগরূপ বজায় রেখে তানকর্তব্যের সাথে পরিবেশন করা হয়, রবীন্দ্রসংগীত সঠিক রাগরূপের অনুসরণ করেও কেন সমূহ তানকর্তব্য প্রয়োগ করতে পারবে না। এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অকপট স্বীকারোক্তিও প্রদান করেন। তিনি দিলীপ রায়কে জানান–

> এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্তানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না ? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্তানী সংগীতের সুর মুক্তপুরুষভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরীক বলে মানতে সে নারাজ– বাংলায় সুর কথাকে খোঁজে চিরকুমার ব্রত তাঁর নয়, সে যুগমিলনের পক্ষপাতী। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ৯৪)

যখন রবীন্দ্রসংগীতে গায়কির স্বাধীনতার প্রশ্ন আসে তখন রবিঠাকুর খানিক অনড় রূপই প্রকাশ করেন। তবে এটাও ঠিক যে গায়ক গানে শত আন্তরিকতা প্রকাশ করলেও গায়কভেদে গানের স্বভাব পালটানো অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন কণ্ঠে গানের যে রূপায়ণ তা রবীন্দ্রনাথের গানের স্বভাবের কাছাকাছি হতেও পারে আবার নাও পারে। কিন্তু দিলীপ কুমার যখন রবীন্দ্রনাথের গানের মৌলিক সুরের অপরিবর্তিত রূপ সম্পর্কে বলেন তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি চেষ্টা করলেও তাঁর গানের মৌলিক সুর বজায় রাখতে পারবেন না। কিন্তু তারপরেও তাঁর রচিত গানে শিল্পীর নিজস্ব স্বাধীনতা তিনি প্রদান করার অনুমতি দেননি। রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছা বা অনড় রূপ না থাকলে হয়তো শিল্পীরা তাঁর গানের মূল কাঠামো বজায় রেখেও তাদের ইচ্ছামতো স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর গানকে একটা নূতন সৌন্দর্যে গরীয়ান করে তুলতে পারতো। কিন্তু কবিগুরুর এই আদেশের দরুন তাদের নিজেদের অনুভূতির রং ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়া শিল্পীদের কাছে একটা সংকোচের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সকল কঠিন আদর্শের উলটাদিকে ঝুঁকি ও বড়োসরো আকারে হতে বাধ্য। তাই ঝুঁকির ভয়ে তো আদর্শকে ছোটো করা চলে না, আর এই প্রসঙ্গের জের ধরে রবীন্দ্রনাথ দিলীপ কুমারকে

বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, স্বর প্রক্ষেপণের বৈচিত্র্যের মাধ্যমেও স্বরলিপির স্বাধীনতা খর্ব হয়। যদিওবা স্বরলিপি অনুসরণ করে ভাবাবেগের স্বাধীনতা গ্রাহ্য হতে পারে সেক্ষেত্রে স্বাধীন সুরবিহার এখানে কোনোমতেই গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপ কুমার রায়ের মধ্যকার আলাপ-আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল গায়কির স্বাধীনতা, আর এই প্রসঙ্গে তাঁদের দুজনার সংগীতাদর্শ নিয়েও মতপার্থক্য দেখা যায় বহুবার, রবীন্দ্রনাথের মতে কীর্তনে বাঙালির গানে, সংগীত ও কাব্যের যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তি তা বাঙালির অন্য সাধারণ গানেও ফুটে উঠেছে। কেননা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির ভিতরকার কথাটা শিল্পের মধ্য দিয়ে একটা বিশ্বজনীন তারে আঘাত দেয় সুতরাং এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কথারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়–

আর্টে প্রগল্‌ভার চেয়ে মিতভাষ,
বাহুল্যের চেয়ে সারল্য শ্রেষ্ঠ।
(করুণাময়, ১৯৯৩ : ২৩০)

এরপরে সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যাবে। যেমন– আজকাল রবীন্দ্রনাথের অনেক গান মুক্ত ছন্দে গাওয়া হয়। আর তা অনেক স্বনামধন্য শিল্পীরাই গাইছেন। রবীন্দ্রভারতীয় এককালীন স্বরলিপি-প্রণেতা শ্রী সুভাষ চৌধুরীর একটি তালিকায় দেখা যায় প্রায় ৮৯টি গান রয়েছে যা স্বরলিপি, তাল বা নির্দিষ্ট মাত্রা নিবন্ধ হলেও মুক্তছন্দে প্রচলিত। এমনকি "এ পরবাসে" গানটিও মালতী ঘোষাল তাল ও ছন্দে নিবদ্ধ করে গেয়ে রেকর্ড করেছেন। যা পূর্বে মুক্তছন্দে অনেকেই গেয়েছেন।

এরপর আসে যন্ত্রসংগত নিয়ে আলোচনা সেখানেও কিছুটা দোদুল্যমানতার স্বীকার অর্থাৎ গানের Orchestration এ বিষয়ে সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "আরেকটা জিনিস যেটা স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে না সেটা হল গানের সংগতের নির্দেশ সংগত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলে যান নি। এখানে সুরকারের খুব একটা বড় দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি" (সত্যজিৎ, ২০১৭ [https://www.boierhut.org])।

সেসময় গানের সঙ্গে সারেঙ্গি, এসরাজ, সেতার, দোতারা ইত্যাদি ব্যবহার হতো তার যন্ত্র হিসেবে আর তবলা, পাখোয়াজ, খোলের ব্যবহার হতো তালের জন্য খুব সম্ভবত তখন এই যন্ত্রগুলি সংগীতজগতে বেশি প্রচলিত ছিল। কিন্তু তারপরেও এ নিয়ে সেসময় বেশ তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল বলে জানা যায়।

রবীন্দ্রসংগীতের যা শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তা রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সেরা ছবির মতোই সতেজ ও সাবলীল, এমনকি অনুকরণীয়ও বটে, তাঁর গান সুগীত হচ্ছে না এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ থাকলেও কোনোদিন প্রকাশ করেছেন বলে জানা যায় না। শুধু তাঁর গানের সাথে যেন সুবিচার হয় তারই অনুরোধ রেখেছেন শ্রী প্রফুল্ল মহলানবীর কাছে–

> বুলাবাবু তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ, এদের একটু দরদ দিয়ে, রস দিয়ে গান শিখিয়ো- এটাই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপর তোমরা যদি স্টীম রোলার চালিয়ে দাও আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তাল থাকে দরদ ও নীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি করো। (শম্ভুনাথ, ১৩৮০ : ৫৭)

রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সাংগীতিক ধারণার চেয়ে কিছুটা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা নিয়েই বাংলা গানের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাণী ও সুরের যুগপৎ রচয়িতা হিসেবে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই সুরের সাহায্যে বাণীবাহিত ভাব পরিস্ফুটনের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। আর তাঁর গানে তিনি যে ধারণাটি যথোপযুক্ত মনে করেছেন সেটিই চূড়ান্ত বলে স্থির করেছেন। কোনো গায়কের পক্ষে সেখানে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। কারণ তেমন কোনো অসম্পূর্ণ অবস্থা সেখানে রবীন্দ্রনাথ রাখেননি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যেমন একটি সম্পূর্ণ রচনা তাঁর গানও ঠিক তাই। বাংলা গানের ধারায় সম্পূর্ণরচিত গানের এই ধারাটির শুধু গোড়াপত্তনই তিনি করেননি বরং একে দৃঢ় অবস্থানে রবীন্দ্রনাথই স্থিরভাবে দণ্ডায়মান করেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্তে যদি আমরা কর্ণপাত না করি, তবে শিল্পীদের যথেচ্ছাচারের সুযোগ দেওয়া হয় যা শুধু রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করবার অজুহাতে। আর তা হলে রবীন্দ্রসংগীতের ভবিষ্যৎ সত্যিকার অর্থেই আশঙ্কাপূর্ণ।

সহায়কপঞ্জি

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *সংগীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৯)। *গীতবিতান*। মলি প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৭৩)। *সংগীতচিন্তা*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১১)। *রবীন্দ্র রচনাবলী* ষোড়শ খণ্ড। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শম্ভুনাথ ঘোষ (১৩৮০)। *রবীন্দ্রসংগীতের ইতিবৃত্ত* (*প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রসংগীত* দ্বিতীয় খণ্ড)। সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা।

সত্যজিৎ রায় (২০১৭)। 'রবীন্দ্রসংগীতে ভাববার কথা'। *বইয়ের হাট পত্রিকা* (https://www.boierhut.org *দ্রষ্টব্য*)।